বিজ্ঞান বিষয়ক সভা

ও

বক্তৃতা সংকলন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান বক্তৃতার সংকলন

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি:
জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক

সম্পাদক:
জনাব মো: কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার
জনাব শাফিয়া তাসনীম দ্রাঘিমা
গ্যালারি সহকারী

র‍্যাপোটিয়ার
জনাব আব্দুর রাজ্জাক
টেলিস্কোপ অপারেটর

প্রচ্ছদ:
জনাব রবিন বসাক
আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা/মুদ্রণালয়:
লাবিবা প্রিন্ট লিংক
৬৯, ইসলাম ভবন,
ফকিরাপুল (৩য় তলা)
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশনায়:
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা:
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন: ৯১১২০৮৪
ই-মেইল: infonmst@gmail.com
www.nmst.gov.bd

প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০২১ খ্রি:

সূচিপত্র

বিজ্ঞান বক্তৃতার বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পানির অপচয় রোধ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার	১
বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি	৩
অগ্নি দুর্ঘটনায় করণীয়	৮
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	১২
ফাস্টফুড খাবারের ক্ষতিকর দিক	১৫
নবায়নযোগ্য জ্বালানী	১৮
প্লাস্টিক দূষণ রোধ	২১
পানির অপচয় রোধে করণীয়	২৪
পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার	২৭
Global Warming	৩০
চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং বাংলাদেশ	৩৩
জীবাশ্ম জ্বালানীর বিকল্প উৎস সৌর শক্তি	৩৬
পানির অপচয় ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার	৪১
বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি	৪৬
অগ্নি দুর্ঘটনায় করনীয়	৪৯
ফাস্টফুড খাবারের ক্ষতিকর দিক	৫৫
রোজা রাখার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা	৫৯

মহাপরিচালকের কথা

করোনাকালীন সংকটে শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্মের মানসিক সুস্থতা রক্ষায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা অক্ষুণ্ন রাখতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, কুইজ এবং বহুমাত্রিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। সে আলোকে গত ২৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখ হতে ১১.০৫.২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৮ জন শিক্ষার্থী জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এসব বিজ্ঞান বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিলো: পানি সম্পদের সদ্ব্যবহার, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, অগ্নি দুর্ঘটনা রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন, ফাস্টফুড খাবারের ক্ষতি, নবায়নযোগ্য জ্বালানী, প্লাস্টিক দূষণ, পরিবেশ দূষণ রোধ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, জীবাশ্ম জ্বালানীর বিকল্প উৎস, রোজা রাখার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা ইত্যাদি। এসব প্রতিযোগিতা শিশু-কিশোরদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে। অনলাইনে বিজ্ঞান বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধার স্ফূরণ ঘটার এ অনন্য মাধ্যম ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞান বক্তৃতার নির্যাস এ প্রকাশনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব উপস্থাপনাকে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার পথনির্দেশনা হিসেবে তুলে ধরতে চাই।

(মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী)
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিষয়: পানির অপচয় রোধ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার
অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: নোয়াখালী জিলা স্কুল
তারিখ: ২৫.০৩.২০২১, বেলা: ১২-০০টা
প্রধান অতিথি ও বিচারক: জনাব সুকল্যান বাছাড়
কিউরেটর (প্রযুক্তি)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

নীলেশ সাহা
নবম শ্রেণি
নোয়াখালী জিলা স্কুল

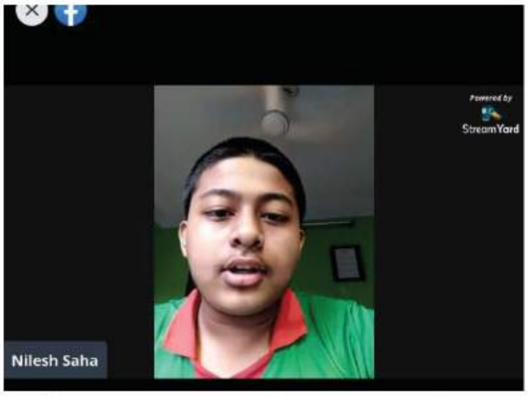

আজকের বিষয়টিকে ভাগ করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ উঠে আসে। যেমন: পানি, অপচয়, রোধ, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার। পানি হচ্ছে এমন এক প্রকার পদার্থ যেটি ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং ১টি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে তৈরি হয়। পৃথিবীতে আফ্রিকার কৃষ্ণমৃগ ছাড়া আর অন্য সকল প্রাণী পানি পান না করে বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না। আর বাংলা 'অপচয়' শব্দের অর্থ হলো কোন কিছু সুষ্ঠভাবে ব্যবহার না করে তাকে যাচ্ছেতাই ভাবে ব্যবহার করে গুণগত মান নষ্ট করা এবং ক্ষতি করা। রোধ বলতে কোন কিছুকে আটকে দেওয়া অথবা বাধা প্রদান করে চিরকালের জন্য দূর করাকে বোঝায়। যেমন আজকের এ বিষয়টি মূলত পানির অপচয় রোধকে অর্থাৎ পানির অপচয়কে সারা জীবনের জন্য দূর করাকে নিয়ে। আর বিজ্ঞান মূলত 'বি' উপসর্গ এবং 'জ্ঞান' এর সমন্বয়ে গঠিত। বি শব্দের অর্থ বিশেষ এবং জ্ঞান শব্দের অর্থ কোন বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা। অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার বলতে বোঝাচ্ছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর উপায়কে।

তাহলে এবার আসা যাক পানির অপচয়ের বিষয়ে। এ সম্পর্কে waterfootprint.org তে বলা আছে আমরা ঘুম থেকে উঠা এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নানা ভাবে পানিকে অপচয় করে থাকি। বিশেষ করে আমরা যখন দাঁত ব্রাশ করি তখন থুথু ফেলার আগ পর্যন্ত আমরা ছিপিকে চালিয়ে রাখি। এভাবে দেখা যাচ্ছে ছিপি থেকে পানি সমান হারে বেরোচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এভাবে প্রত্যেক পরিবারে ৫ থেকে ১০ লিটার পানি অপচয় হয় শুধুমাত্র দাঁত ব্রাশ করার সময়ই। এবার আসি রান্নার ক্ষেত্রে। আমাদের দৈনন্দিন খাবার যেমন মাছ, মাংস ইত্যাদি ডিপ রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়। দেখা যায় যখন খাবার রান্না করার জন্য এগুলো বের করা হয়, তখন এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে শক্ত বরফ লেগে থাকে। সাধারণত দেখা যায় প্রত্যেক পরিবারেই তাড়াতাড়ি রান্না করবার জন্য এবং মাছ, মাংস থেকে বরফ ছুটনোর জন্য প্রচুর পরিমাণে পানি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে যদি এগুলো ২-৩ ঘন্টা পর্যন্ত রেখে দেওয়া যায় তাহলে নিজে থেকেই বরফ গলে যাবে। সেক্ষেত্রে ৫০-৬০ লিটার পানি আমাদের মা-বাবা কিংবা আত্মীয় স্বজনদের হাতে অপচয় হতো না। গোসল বা স্নান করার কথা বললে সেখানেও মূলত দুঃখজনক ভাবে প্রচুর পানি অপচয় হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা গেছে যে, গোসলের সময় সাধারণত আমরা যখন ৬০ লিটার পানি ব্যবহার করি; তখন তার ৬০% অর্থাৎ ৩৬ লিটার পানির অপচয় হয়ে যাচ্ছে। ৩০ দিন বা ১ মাসে হিসাব করলে তা আনুমানিক ১১০০ লিটারের মত দাঁড়াবে। আবার পানির ট্যাংক পূর্ণকরার সময় যখন আমরা

সুইচ চালু করি, তখন ট্যাংকে পানি ভরার জন্য কয়েক মিনিট দরকার হয়। কিন্তু দেখা যায় যে অনেকেরই অসতর্কতার কারণে ট্যাংক থেকে পানি পড়তে থাকলেও তার দিকে কোনো খেয়াল থাকে না। প্রচুর পানি বের হয়ে যায়। আবার পানির পাইপের লিকেজের দিকে আসলেও কিন্তু একই ঘটনা দেখা যাবে। মূলত এভাবেই দৈনন্দিন ব্যবহারের অপ্রয়োজনীয় কারণে পানির অপচয় হচ্ছে। আমাদের এই পৃথিবীতে ৭১ শতাংশ পানি রয়েছে যার মাত্র ০.৩% সুপেয় পানি। তাহলে সুপেয় পানিকে রক্ষা করার জন্য এবং নিরাপদ পানিকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে নিশ্চয়ই পানির সুষ্ঠ ব্যবহার করতে হবে। কারণ পানিকে আমরা রান্নাক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন নানান কারণে ব্যবহার করছি যা ছাড়া আমাদের জীবন চলতেই পারে না। এতক্ষণ পানির অপচয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এবার যদি আমরা পানির অপচয় রোধ করার ব্যাপারে আসি তাহলে আমাদের কিছু বিজ্ঞানসম্মত উপায় গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের বিশুদ্ধ পানির প্রত্যেক ফোঁটা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা পানিকে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। দরকার হলে আমরা বিশুদ্ধ পানি পান করার জন্য থিতানো, ফুটানো, বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ইত্যাদি উপায় গ্রহণ করতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের পানিতে কাঙ্খিত পরিমাণে অর্থাৎ ০.০১ গ্রাম/লিটার হারে আর্সেনিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারব এবং তার সাথে অপচয় চিরতরে বন্ধ করতে পারব। আমরা যেখানে প্রতিদিন ২০০-৪০০ লিটার পানি অপচয় করছি সেখানে এই পানিকে যদি সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে বাংলাদেশে খুবই কম খরচে ১০০০+টি hydro-power স্টেশন তৈরি করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ১০০% মানুষকে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে, যা আমাদের বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। মূলত এগুলো বিজ্ঞানসম্মত এবং খুবই কার্যকরী উপায়। আমাদের ঘরবাড়ির আশেপাশের শিল্পকারখানা বা ইটভাটা থেকেও প্রচুর পরিমাণে ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয়। আর পানির ময়লা আবর্জনা থেকে বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার জন্য বছরে ১,০০০-৩,০০০ কোটি টাকা নষ্ট হয়। সেজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং বিজ্ঞানকে যথাসম্ভব ব্যবহার করতে হবে। যেমন, রান্নাঘরে আমরা যে ট্যাপটি ব্যবহার করি, তাতে স্পিড খুবই বেশি। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আমরা মিডিয়াম স্পিডের ট্যাপ ব্যবহার করি, তাহলে আগে যেখানে প্রতি মিনিটে ৫ গ্যালন পানি অপচয় হতো, সেখানে তা ৩.৫ গ্যালনে আনা সম্ভব। এছাড়াও থালা-বাসন ধোয়ার সময় ডিশওয়াশার ব্যবহার করলে ভালো হয়। এভাবে প্রতি মিনিটে ৪.৫ লিটার পানি লাগবে, যেখানে ডিশওয়শার ব্যবহার না করে ২০ লিটারের মতো হয়। মোটকথা বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ ও যুক্তির খাতিরে বলা চলে পানির অপচয় রোধ করা আমাদের কর্তব্য। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ সালে ডাকস্ট্যাম্প তৈরি করা হয়েছে পানিকে গুরুত্ব দিয়ে। আমাদের বাংলাদেশও এরকম কিছু উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন। তবে এজন্য শুধুমাত্র সরকার নয় বরং জনগণকেও সমান সচেতন হতে হবে। এভাবে পানিকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে বিশ্বের 'রোল মডেল' করতে পারি। বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন। পানি দিয়ে কি না করা যায়? আশা করি আমরা পানির সদ্ব্যবহার করে এবং আজকে আলোচিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশকে এবং জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। তাই অবশেষে দেশ এবং জাতির কাছে অনুরোধ রইলো যে আপনারা পানিকে সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করবেন এবং অবশ্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে। অবশেষে বলে যেতে চাই-

"জাগ্রত করে বিবেকবোধ,
পানির অপচয় হবেই রোধ।"

সুকল্যান বাছাড়
কিউরেটর (প্রযুক্তি)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

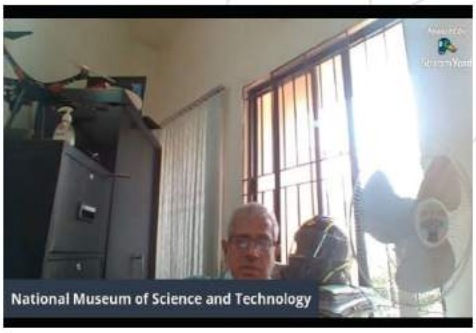

বলা হয়ে থাকে পানির অপর নাম জীবন। এর কারণ হলো পানির একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এর দ্রাব্যতা। অধিক দ্রাব্যতার বৈশিষ্ট্যর কারণে পানি জীবদেহে পুষ্টিসহ অন্যান্য উপাদান পরিবহন করে। ফলে জীবদেহের জীবনধারণ সম্ভব হয়। আমাদের বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে এই পানি। পৃথিবীর মোট আয়তনে পানির পরিমাণ ৭১% এবং স্থল ভাগের পরিমাণ ২৯%। আবার মোট পানির পরিমাণের ৩% হলো পানযোগ্য এবং বাকি ৯৭% হলো লবনাক্ত পানি। পানযোগ্য পানির বেশিরভাগই মেরু অঞ্চলে আবদ্ধ হয়ে আছে। তাই দিন দিন ব্যবহার উপযোগী ও পানযোগ্য পানির চাহিদা বেড়েই চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন সুপেয় পানির অভাবে ভূগছে। যেমন: অ্যাঙ্গোলা, উগান্ডা, কেনিয়া দেশসমূহ এবং আফ্রিকা, এশিয়া মহাদেশের অনেকগুলো দেশ। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ার অনেক অঞ্চলেই পানির তীব্র সংকট রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে নলকূপ, গভীর নলকূপ, কূয়া ইত্যাদি বসিয়ে টেনে তোলা হচ্ছে ভূগর্ভের পানি। আর ক্রমাগত ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ফলে পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে পানির সংকট প্রকট আকার ধারণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে অনাবৃষ্টি, আকষ্মিক বন্যা ও পানির তীব্র সংকট দেখা দিচ্ছে। তাই এই সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। পানির অপচয় কমাতে হবে, পানির পুনঃব্যবহার করতে হবে। বর্তমানে বিশ্বের সমুদ্র তীরবর্তী বিভিন্ন দেশ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের লবনাক্ত পানিকে লবন মুক্ত করে ব্যবহার করছে। আবার ব্যবহারের সাথে সাথে অপচয় হচ্ছে অনেক পানি। একটু সচেতন হলে পানির এই অপচয় রোধ করা সম্ভব। পানির অপচয় রোধে আমাদের সচেতনতা ও প্রযুক্তির ব্যবহার পানির সংকটকে কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

বিষয়: বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: নরসিংদী মডেল কলেজ, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, নটর ডেম কলেজ

তারিখ: ৩১.০৩.২০২১, বেলা: ১২-০০টা

প্রধান অতিথি ও বিচারক: জনাব মাকসুদা বেগম

প্রধান ডিসপ্লে কর্মকর্তা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

রাকিবুল ইসলাম
দ্বাদশ শ্রেণি
নরসিংদী মডেল কলেজ

বিদ্যুৎ এক ধরনের অদৃশ্য শক্তি যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহে যে শক্তির সৃষ্টি হয় তাই বিদ্যুৎ অর্থাৎ যা তাপ, শব্দ, বেগ এবং রুপান্তরিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাস্তব কাজ সমাধান

করে তাই বিদ্যুৎ। আবার বিনা অপচয়ে এবং স্বল্প মাত্রায় ব্যবহারে প্রয়োজনীয় কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারই হলো বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার।

বিজ্ঞানের জ্ঞান কে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা যেকোনো কৌশল বা যন্ত্রই হলো প্রযুক্তি অর্থাৎ প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। আবার যে প্রযুক্তি ব্যবহারে বিদ্যুতের অপচয় রোধ ও স্বল্পমাত্রার বিদ্যুৎ ব্যবহারে সম্পূর্ণ প্রয়োজন নিশ্চিত করা যায় তাকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি বলা হয়। বিজ্ঞানের বদৌলতে অনেক প্রযুক্তিই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হিসেবে আবিষ্কৃত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

কমপ্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প বা CFL। আমাদের ব্যবহৃত হলুদ বাতি বা ইনক্যানডিসেন্ট ল্যাম্প যা আলোকশক্তি প্রদানে ৬০-১০০ ওয়াট বা তার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। অপর দিকে কমপ্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প বা CFL মাত্র ৯-১১ওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহারে তার সমপরিমাণ সেবা নিশ্চিত করে। এছাড়া CFL এর চেয়েও বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী লাইট এমিটিং ডায়োড বা LED। এগুলোর পাশাপাশি এনার্জি সেভিং ল্যাম্প ও SLD সাধারণের চেয়ে ৫০% বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এছাড়া আমাদের অন্যতম প্রধান বিদ্যুৎ শক্তি সাশ্রয়ী যন্ত্র হলো সুইচ যার সঠিক ব্যবহার অর্থাৎ সঠিক সময়ে সুইচ অন ও সঠিক সময়ে সুইচ অফ করার মাধ্যমে বহুলাংশে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা যায়। যেখানে প্রয়োজন আমাদের সচেতনতা। এছাড়া ওয়াইফাই এর ক্ষেত্রে প্যাসিভ ওয়াইফাই যা সাধারণ ওয়াই ফাই এর চেয়ে ১০ গুণ বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সক্ষম। আবার ভেরিয়েবল রেফ্রিজারেন্ট ফ্লো বা VRF পদ্ধতির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যা সাধারণ পদ্ধতির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার চেয়ে ৪০% বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। যা ৪র্থ প্রজন্মের কাছে সবচেয়ে আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। এছাড়া ফ্রিজ ব্যবহারে ইনভার্টার প্রযুক্তি, পানি গরম করার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক কুক

পটের পরিবর্তে ইলেক্ট্রিক কেটলি, গরম পানির পাইপে ইনসুলেটর প্রযুক্তির ব্যবহার অনেকাংশে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডেক্সটপ এর তুলনায় ল্যাপটপ অনেকটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এছাড়া কম্পিউটারের বাজারে কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ে চলছে এক তুমুল প্রতিযোগিতা। যা বাজারে এসে সর্বোচ্চ সেবার সাথে ১০০-১০০০ গুণ বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। এমন হাজারো প্রযুক্তি আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে এবং হচ্ছে। শুধুমাত্র আমাদের একটু সচেতনতার অপেক্ষা। একটা কথা মনে রাখতে হবে, বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। তাই আসুন আমরা প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করি, বিদ্যুতের সাশ্রয় করি এবং সুন্দর আগামী গড়ি।

হাসিবুল আলম শিপু
একাদশ শ্রেণি
নটর ডেম কলেজ

বিদ্যুৎ হচ্ছে এমন এক অদৃশ্য শক্তি যা আলো, গতি, শব্দ, রূপান্তরিত শক্তি ইত্যাদি উৎপন্ন করে বাস্তব কাজ সমাধান করে থাকে। সাশ্রয় বলতে আমরা বুঝি কোনো কিছুকে অপচয় হতে রক্ষা করা। আর প্রযুক্তি বলতে কী বোঝায় তা আমরা সকলেই জানি। প্রযুক্তি হচ্ছে বিভিন্ন আবিষ্কারকে মানুষের প্রায়োগিক কাজে লাগানোর উপায়। বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ ছাড়া প্রযুক্তি প্রায় অসম্ভব। সুতরাং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি বলতে আমরা বুঝি সেসব প্রযুক্তি, যেখানে বিদ্যুৎকে অপচয় হতে রক্ষা করা হয়। তো স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি আমাদের কেন প্রয়োজন, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি term টা আমাদের সামনে কেন এলো। এর উত্তর দেয়ার জন্য আমি পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত এবং বিদ্যুৎ অপচয়ের ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করবো। বিদ্যুৎ একটি দেশের আর্থিক উন্নয়নের অন্যতম সঞ্চালক ব্যবস্থা। কিছু বছর আগেও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে ছিলো। "World Eonomic Forum" কর্তৃক প্রকাশিত "Energy Architecture Performance Index 2017" শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে বিদ্যুতের কাঠামোগত দক্ষতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১২৭ টি দেশের মধ্যে ১০৪ তম। আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিলো মাত্র ৪০৭ মেগাওয়াট যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। তো এই অভাবের মধ্যে যদি হয় অপচয় তাহলে তো মরার উপর খাড়ার ঘা। তবে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত এখন যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে চাহিদার চেয়ে নয় হাজার মেগাওয়াট বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম। এমতাবস্থায় দেশে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা বিদ্যুতের অপচয় রোধ করে বিদ্যুৎ ঘাটতির দেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। সারা বিশ্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানির মুখ্য উৎস হলো বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েল যেমন গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য তরল জ্বালানি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিলো ৬৮.৬৩ শতাংশ এবং অন্যান্য তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিলো ২০.৫৭ শতাংশ। এখন অপচয় বাড়লে বিদ্যুতের উৎপাদন চাহিদা বাড়বে এবং অতিরিক্ত উৎপাদন করতে গিয়ে অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানি দহন হবে। ফলে বেড়ে যাবে কার্বন নির্গমন এবং ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি করবে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়া প্রকৃতিবিদগণ ধারনা করছেন, বর্তমানে যে হারে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন হচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর জ্বালানি মজুদ শেষ হয়ে যাবে এবং মানব সভ্যতা ভয়বহ সংকটে পরবে। তো এখন আপনারা বুঝতেই পারছেন এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি আমাদের কতটা প্রয়োজন। প্রযুক্তির ছোয়ায় গত কয়েক বছরে মানুষ বিদ্যুতের সাশ্রয় নিয়ে বেশ সচেতন হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক প্রযুক্তি। চলুন দেখে আসা যাক এমন কিছু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির কথা। শুরুতেই বলা যেতে পারে আমাদের সবার পরিচিত এনার্জি সেভিং লাইটের কথা। বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই লাইট স্বল্প বিদ্যুৎ ব্যবহারে বেশি পরিমান আলো বিকিরণ করতে পারে। যেমন সাধারণ লাইট ১০০ ওয়াট ব্যবহার করে যে পরিমাণ আলো দেয়, সেই একই পরিমাণ আলো দিতে এনার্জি সেভিং লাইটের প্রয়োজন মাত্র ২৩ ওয়াট। এরপরে যে প্রযুক্তিটির কথা বলবো তার আবিষ্কার হয়েছে গতবছরেই। তার নাম এসএলডি লাইট। এই লাইট এনার্জি সেভিং লাইটের চেয়ে পঞ্চাশ গুন বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং চারগুণ বেশি স্থায়ীত্ব প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবিষ্কৃত প্যাসিভ ওয়াই-ফাই অন্যান্য ওয়াই-

ফাই এর চেয়ে দশগুণ বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে। সদ্য আবিষ্কৃত ভি আর এফ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় অন্যান্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার চেয়ে চল্লিশ গুণ বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। সর্বোপরি, আমাদের উচিত এসব বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করা, অন্যকে উৎসাহিত করা এবং নতুন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি আবিষ্কার করার চেষ্টা করা।

মিজানুর রহমান
দ্বাদশ শ্রেণি
সরকারি বিজ্ঞান কলেজ

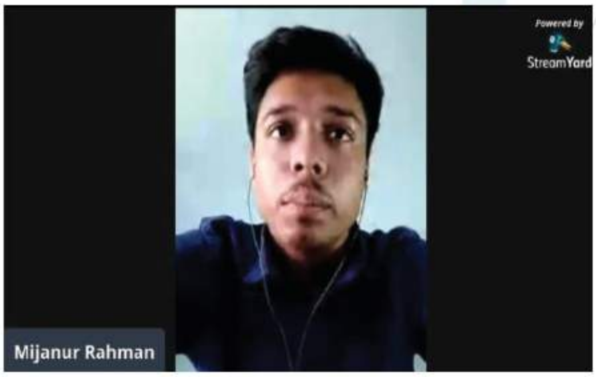

বিদ্যুৎ হচ্ছে এমন একটি অদৃশ্য শক্তি যা ছাড়া আমরা বর্তমানে এক মুহূর্ত চলতে পারি না। যার ব্যবহার সর্বক্ষেত্রেই বিরাজমান কিন্তু এ প্রয়োজনীয় অদৃশ্য শক্তি আমরা বর্তমানে প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পরিমাণে অপচয় করছি। যার প্রভাবে আমাদের জন্য ও দেশের জন্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর এই হুমকি মোকাবেলা করতে হলে আমাদের নানা পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। তাই জেনে নেওয়া যাক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মানে কী? প্রয়োজনের চেয়ে অধিক অপচয় রোধ করার পদ্ধতি হচ্ছে সাশ্রয় অর্থাৎ আপনার যা প্রয়োজন তার বেশি ব্যবহার না করা। সাশ্রয়ী পদ্ধতি অবলম্বন করলে যে কোন কিছুর অপচয় রোধ করা সম্ভব। বর্তমান সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার এর চেয়ে অপচয় বেশি হচ্ছে। তাই এর অপচয় রোধে অবশ্যই সাশ্রয়ী প্রযুক্তি আমাদের ব্যবহার করতে হবে। তাই সাশ্রয় করতে অনেকগুলো প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে। আমরা বাসাবাড়িতে বর্তমানে যেসব এনার্জি সেভিং লাইট ব্যবহার করি সেগুলো বিশেষ প্রযুক্তির কারণে ইনক্যান্ডিসেন্ট ল্যাম্প থেকে কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। একই সঙ্গে অল্প বিদ্যুৎ থেকে বেশি আলো বিকিরণ করে। সাধারণত বাসাবাড়িতে ৬০ ওয়াট থেকে ১০০ ওয়াটের বাতি ব্যবহার করা হয়। যার অর্থ হলো প্রতি ঘন্টায় এই বাতিগুলো ৬০ থেকে ১০০ ওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। কিন্তু সমপরিমাণ আলো পেতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতির বিদ্যুৎ খরচ হয় মাত্র ৯ থেকে ১১ ওয়াট বা তার কিছুটা কম। যেখানে সাধারন বাতিগুলোর আয়ুষ্কাল ৭৫০ ঘন্টা থেকে ১০০০ ঘন্টা। অন্যদিকে সাশ্রয়ী বাতি গুলো ৬০০০ থেকে ১৫০০০ ঘন্টা আলো দিতে সক্ষম। যা সাধারণ বাতি থেকে আট থেকে ১৫ গুণ বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। বর্তমানে SLD নামক একটি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে যা একটি এনার্জি বাল্বের চেয়ে চার গুণ বেশি স্থায়িত্ব এবং ৫০% কম বিদ্যুৎ খরচ করবে। একটি এনার্জি বাল্বের ২৪ ওয়াটের সমান আলো দিবে একটি ১১ ওয়াটের SLD বাতি। এসব বাতি বিদ্যুতের ১০০ থেকে ২৪০ ভোল্টেজের মধ্যে আপডাউন করলেও আলো কমবে না। একটি SLD বাতি ৩০ হাজার ঘন্টা আলো দিতে সক্ষম। প্রতিদিন গড়ে ৮ ঘণ্টা জ্বালালে এর স্থায়িত্ব হবে ১৫ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান প্যাসিভ ওয়াই-ফাই নামে একটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে। যা অন্যান্য ওয়াই-ফাই এর তুলনায় ১০ গুণ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। VRF নামক একটি চতুর্থ প্রজন্মের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে যা থেকে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব। যার খরচ অন্যান্য গুলো থেকে অনেক কম। এছাড়াও অনেক দেশে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করতে সোলার প্রযুক্তি ও ব্যবহার করে থাকে। যেখানে শক্তির উৎস হল সূর্য, যা একটি নবায়নযোগ্য শক্তি। এটি থেকেও অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা যায়, যা

পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না। মানুষের এখন পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্রিজ এর প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইনভার্টার নামক একটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে, যেখানে ফ্রিজের যখন বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় সেখানেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং প্রায় ৫০% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে। যা সাধারণ ফ্রিজের তুলনায় ৮ থেকে ১০ গুণ কম বিদ্যুৎ লাগে। চলেও অতি লো ভোল্টেজে। ফলে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয়। এছাড়াও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ইনভার্টার যুক্ত ওয়াশিং মেশিন তৈরি করেছে, যা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং খরচ অনেক কম। আমাদেরকে বিদ্যুৎ এর ব্যবহারে সাশ্রয়ী করতে অনেকগুলো বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে। যার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। আমাদের বাসা বাড়িতে অপ্রয়োজনে অনেক কিছুর সুইচ অন করা থাকে। অবশ্যই সেগুলো বন্ধ রাখতে হবে। এসির তাপমাত্রা সবসময় ২৫ ডিগ্রি থাকতে হবে। নির্দিষ্ট মাত্রায় ঠান্ডা হওয়ার পর এসি বন্ধ করে ফ্যান চালাতে হবে। অবশ্য টাইমার দিয়ে রাখলে ভালো। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংযোগ ও তারের মান ভালো হতে হবে। বাসাবাড়িতে যেসব যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো প্রতিবছর পরীক্ষা ও চেক করতে হবে। সেগুলো বিদ্যুৎ সাশ্রয় করছে কিনা। খাবার গরম করার ক্ষেত্রে মাইক্রোওভেন এর পরিবর্তে সাশ্রয়ী কুকার ব্যবহার করতে হবে। উপরের বিষয়গুলোর দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির পাশাপাশি এগুলোও কাজে আসবে।

মাকসুদা বেগম
প্রধান ডিসপ্লে কর্মকর্তা
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিদ্যুৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা বড় জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিয়ে মানুষের ভেতরে সচেতনতা অনেক কম। তবে ধীরে ধীরে মানুষ সচেতন হচ্ছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও পণ্যের ব্যবহার বদলে দিতে পারে আগামীর বিশ্ব। বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিদ্যুতের অপচয় রোধ করে সমৃদ্ধ হতে পারে অর্থনীতি। গত কয়েক বছরে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে মানুষ বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিয়ে। তৈরি হয়েছে নতুন অনেক প্রযুক্তি। ইতোমধ্যে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও পণ্য ব্যবহারে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যে কোন ভবন নির্মাণে, রাস্তা কিংবা সেতুর নকশা প্রণয়নে তারা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও পণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও পণ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়েছে। এনার্জি সেভিং লাইট, এসএলডি, প্যাসিভ ওয়াই-ফাই, ভিআরএফ (ভেরিয়েবল রেফ্রিজারেন্ট ফ্লো) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, ডে লাইট হারভেস্টিং প্রযুক্তি, মোশন সেন্সর প্রযুক্তি, স্বয়ংক্রিয় ডিমিং, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ/সোলার পাওয়ার প্রভৃতি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদেরকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিশ্চিত করতে হবে।

বিষয়: অগ্নি দুর্ঘটনায় করণীয়

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, সি ইউ এফ স্কুল এন্ড কলেজ, মসজিদ মিশন একাডেমী

তারিখ: ০১.০৪.২০২১, বেলা: ১২-০০টা

প্রধান অতিথি ও বিচারক: জনাব মোঃ আনিসুর রহমান

কিউরেটর

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সানজিদুল আলম চৌধুরী
দ্বাদশ শ্রেণি
সি ইউ এফ স্কুল এন্ড কলেজ

আগুন দ্বারা সৃষ্ট দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে বিভিন্ন জায়গায় এবং ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। অগ্নি-দুর্ঘটনা শুধু আমাদের আর্থিক ক্ষতি করে না আমাদের শারীরিক ক্ষতিও করে। দুর্ঘটনার ফলে আমাদের ঘরবাড়ি পুড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ অগ্নি দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন না, তারা ভালোভাবে সবকিছু জানেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। আগুন লাগলে আমাদের করণীয় বিষয়গুলো হলো-

১। বিলম্ব না করে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনে সংবাদ দেওয়া/অথবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে (০২-৯৫৫৫৫৫৫/০১৭৩০৩৩৬৬৯৯) অবহিত করা।
২। শুরুতেই আগুন নিভানোর চেষ্টা করা।
৩। বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপনী যন্ত্র ব্যবহার করা।
৪। বৈদ্যুতিক লাইনে / যন্ত্রপাতিতে আগুন ধরলে পানি ব্যবহার না করা। বহনযোগ্য কার্বন ডাই-অক্সাইড / ড্রাইকেমিক্যাল পাউডার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার করা। না পেলে শুকনো বালি ব্যবহার করা।
৫। তৈল জাতীয় পদার্থের আগুনে পানি ব্যবহার বিপদজনক। বহনযোগ্য ফোমটাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইসার / শুকনো বালি / ভেজা মোটা কাপড় বা চটের বস্তা দ্বারা চাপা দেওয়া।
৬। গায়ে বা পড়নের কাপড়ে আগুন ধরলে মাটিতে গড়াগড়ি করা।

আগুন নেভানোর কাজে এখন আমরা নানা ধরনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারছি। উন্নত দেশে এখন বিভিন্ন ধরনের রোবট, বিমান ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে । এগুলোর মধ্যে যেসব বিমান উল্লেখযোগ্য সেগুলো হলো-

1. Candair CL-415
2. DC-10-Tanker
3. Boeing 747 Supertanker
4. Neptune Aviation Lockhead P2V
5. Boriev
6. C130

এছাড়াও ব্যবহার করা হচ্ছে নানা ধরনের ড্রোন। ড্রোন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

1. DJI Matrice 300RTK
2. Global Hawk

এছাড়াও ব্যবহার করা হচ্ছে নানা ধরনের রোবট। আগুন সম্পর্কে যতই জানা হোক সর্বপ্রথম আমাদের মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, সর্বোপরি অন্যদেরকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে।

হামজা বিন জুনায়েদ
একাদশ শ্রেণি
মসজিদ মিশন একাডেমী

দেশে গড়ে প্রায় আট হাজার অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। আর এসব ঘটনায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণই গড়ে প্রায় সাড়ে ৩শ কোটি টাকার বেশি। এছাড়াও ঝরে যায় অসংখ্য মূল্যবান জীবন। ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, সারাবছর যে অগ্নিকান্ড হয়, তার অর্ধেকেরও বেশি ঘটে বছরের প্রথম ৪ মাসে অর্থাৎ শীতকালে। ফায়ার সার্ভিসের হিসেব বলছে, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সারাদেশে প্রায় ১৬ হাজার অগ্নিকান্ডের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সাড়ে ৭ শত কোটি টাকারও বেশি। এসব ঘটনায় মারা গেছেন ১৩৬ জন, আহত হয়েছেন সাড়ে তিনশোর বেশি মানুষ। উন্নত বিশ্বে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অগ্নিকান্ড নিয়ন্ত্রণ ও প্রাণহানী এখন অনেক কমে গিয়েছে। যদিও আমাদের দেশের শিল্প-কারখানা, মার্কেট ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা ব্যয়ের কারণে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে চান না। অনেকে স্থাপন করলেও তা সঠিকভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন না। ফলে দুর্ঘটনায় প্রচুর জানমালের ক্ষতি হয়। আমাদের দেশের লোকজন একটু খরচ করে আগুন নেভানোর যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে চান না। একটু খরচ করে হলেও কিছু যন্ত্রপাতি স্থাপন করলে তা যেমন আগুন নেভাতে সক্ষম তেমন বহু মূল্যবান জানমালের নিরাপত্তা বিধানেও কার্যকর। এ ধরনের কিছু যন্ত্রপাতির কথা তুলে ধরা হলো এখানে ফায়ার স্প্রিংকলার- স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি ছিটায়, আগুন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেভানোর জন্য এ যন্ত্রটি সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত কার্যকর এ যন্ত্রটি ব্যবহার করে প্রতি বছর বহু অগ্নিকান্ড রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় বিপণী বিতান ও বাণিজ্যিক স্থাপনায় এটি স্থাপন করা একটু ব্যয়সাধ্য। তবে একবার স্থাপন হয়ে গেলে তা অত্যন্ত কার্যকরভাবে আগুন নেভাতে পারে। কোথাও আগুন লেগে গেলে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলেও রাস্তায় জ্যামসহ নানা কারণে তাদের আসতে সময় লাগে। এরপর পাইপ স্থাপন করে কাজ শুরু করতেও কিছুটা সময় নষ্ট হয়। আর এ সময়ের মধ্যে প্রায়ই আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিন্তু স্প্রিংকলার এসব ঝামেলা থেকে দূরে রাখে। এটি মূলত পানির পাইপের নেটওয়ার্ক ও তার স্থানে স্থানে স্থাপিত স্বয়ংক্রিয় পানি ছোটানোর ব্যবস্থা। স্প্রিংকলারের কাজ পানি ছিটানো। বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্থাপনার স্থানে স্থানে স্প্রিংকলার বসানো থাকে। কোথাও আগুন লেগে গেলে এ স্প্রিংকলারগুলোর মুখের সংবেদনশীল অংশটি অবমুক্ত হয়ে যায়। ফলে তা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি ছিটানো শুরু হয়। এতে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকারখানার জন্য মার্কিন এবং ইউরোপের দুই ক্রেতা জোট অ্যালায়েন্স এবং অ্যাকর্ডের সংশোধন কর্মপরিকল্পনায় ৭৫ ফিটের উঁচু ভবনের কারখানায় স্প্রিংকলার ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে বাস্তবে উচ্চমূল্যের কারণে স্প্রিংকলার নামে এ সিস্টেম কারখানা মালিকদের কাছে রীতিমতো এক আতঙ্কের নাম। বাংলাদেশে তাই এটির দেখা পাওয়াই ভার। যদিও একবার স্থাপন করে নিলে এর মাধ্যমে জানমাল রক্ষা পাওয়া সহজ হয়ে যায়। ফায়ার হাইড্রেন্ট- পানি সংকট কাটায়। বাংলাদেশে অগ্নিকান্ডের সময় প্রায়ই পানির সংকটের কথা জানা যায়। ফায়ার সার্ভিসের গাড়িতে খুব বেশি পানি থাকে

না। কয়েক মিনিটেই এ পানি শেষ হয়ে যায়। আর তাই প্রয়োজন হয় অগ্নিকাণ্ডের কাছাকাছি স্থানে পানির ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বে ব্যবহৃত হয় ফায়ার হাইড্রেন্ট। এটি মূলত একটি পানির সংরক্ষণাগারের সঙ্গে সংযুক্ত আগুন নেভানোর জন্য পানির ব্যবস্থা। এখানে উচ্চচাপে পানি সংরক্ষিত হয়। ফলে কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগলে এ পয়েন্টে পাইপ লাগিয়ে অগ্নি নির্বাপকরা সহজেই আগুন নেভানো যায়। এতোগেলো প্রতিরোধের বিষয় কিন্তু এখন যদি আগুন লেগে যায় তবে প্রতিকার কী? আগে দেখতে হবে কোথায় আগুন ধরেছে:

১.নিজের গায়ে হলে মাটিতে গড়াগড়ি করতে হবে।

২. সিলিন্ডারে হলে বালতি ব্যবহার।

৩. রাসায়নিক কারখানায় হলে ফায়ার সার্ভিসকে কল দিতে হবে।

৪. বাসা বাড়িতে হলে আসে পাশে থেকে পানি এনে নেভানোর চেষ্টা করা।

কিন্তু সর্বশেষ একটা বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তা হলো যথাযথ প্রশিক্ষণ। সবার আগে আমাদের মানসিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তবেই দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা সম্ভব হবে।

অভীক মল্লিক
দ্বাদশ শ্রেণি
সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ

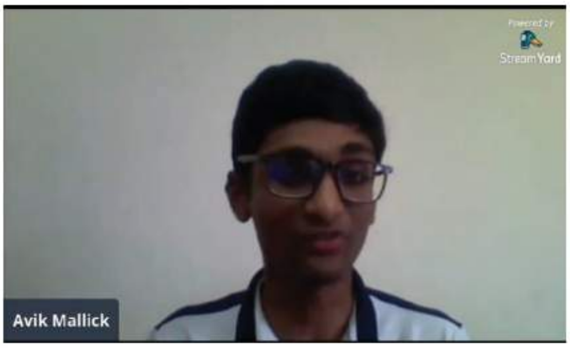

আগুন যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় লাগতে পারে। তবে সামান্য কিছু তথ্য জানা থাকলে বা একটু সতর্ক হলেই বাঁচানো যেতে পারে মূল্যবান জীবন ও সম্পদ। আগুন লাগার মূল তিনটি উপাদান হলো ফুয়েল বা জ্বালানি, অক্সিজেন এবং তাপ। এই তিনটি উপাদান কে বলা হয় ফায়ার ট্রায়াঙ্গেল, যা ছাড়া আগুন জ্বলতে পারে না। সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। যা গড় হিসেবে প্রতিদিন দুই থেকে তিনটি অগ্নি দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। এই অগ্নি দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ থাকতে হলে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা হলো:

১. ফায়ার এস্কেপ-এর জন্য ভবনের উভয় পার্শ্বে প্রশস্ত সিঁড়ি থাকা প্রয়োজন, যেন অগ্নি দুর্ঘটনায় দ্রুত বের হওয়া যায়। ২. পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার থাকা প্রয়োজন, যেন প্রাথমিক অবস্থাতেই দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলা যায়। ৩. ফায়ার হাইড্রেন্ট বা স্প্রিংকলার স্প্রে সিস্টেম থাকা প্রয়োজন, যেন বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডও সহজে নির্বাপণ করা যায়। ৪. ফায়ার পাম্প ও জকি পাম্প থাকা প্রয়োজন যেন ফায়ার হাইড্রেন্ট এ পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। ৫. ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি প্রবেশের জন্য প্রশস্ত রাস্তা থাকা প্রয়োজন, যেন ফায়ার সার্ভিসের লোকজন অগ্নি নির্বাপণে সহায়তা করতে পারেন। ৬. ভবনের ফ্লোরগুলোতে নির্গমন পথ প্রদর্শক চিহ্ন থাকা প্রয়োজন, যেন অন্ধকারেও নির্গমন পথ চেনা যায়। ৭. ভবনের নক্সা প্রবেশ পথে রাখা প্রয়োজন, যেন নবাগতরা আগমন-নির্গমন পথের অবস্থান বুঝতে পারেন। ৮. ফায়ার লিফট থাকা প্রয়োজন, যেন অগ্নি দুর্ঘটনার সময় উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা যায়। ৯. ফায়ার রিফিউজ এরিয়া থাকা প্রয়োজন, যেন অগ্নি দুর্ঘটনার সময় কাছাকাছি অবস্থানে নিরাপদ আশ্রয় নেয়া যায়। ১০. অটো ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম থাকা প্রয়োজন, যেন দুর্ঘটনার বিষয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ণীত হয়। ১১. অটো ফায়ার এলার্মিং

সিস্টেম থাকা প্রয়োজন, অগ্নি দুর্ঘটনার বিষয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ণীত হওয়ার পর যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপদ সংকেত বাজতে থাকে।

মোঃ আনিসুর রহমান
কিউরেটর
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

প্রবাদ আছে "Prevention is better than cure" অর্থাৎ কোন সমস্যায় পতিত হওয়ার পূর্বেই তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণত জ্বালানি, অক্সিজেন এবং তাপের উপস্থিতি আগুন সৃষ্টি করে থাকে। এই তিনটি উপাদানের একটি অনুপস্থিতিতে আগুন সৃষ্টি হতে পারে না। কোথাও অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলে আধুনিক প্রযুক্তি তথা স্মোগ ডিটেক্টর বা শক্তিশালী সেন্সরের মাধ্যমে তা আমরা দ্রুত জানতে পারি। আগুন যতোটা না বিপদ ডেকে আনে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে হুড়োহুড়ি বা তাড়াহুড়ো। অগ্নিকাণ্ডের সময় কোনোভাবেই আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। এ সময় তাড়াহুড়ো করলে বিপদ আরো বেড়ে যেতে পারে। তাই মাথা ঠান্ডা রেখে সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি কেউ বাড়ির ভেতরের কোনো রুমে আটকে যান, সঙ্গে সঙ্গে রুমের দরজা বন্ধ করে দিন। যদি সম্ভব হয়, কাপড় ভিজিয়ে দরজার নিচের ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দিন। যেনো আগুনের ধোঁয়া ভেতরে আসতে না পারে। তারপর রুমের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে যারা নিরাপদ স্থানে আছেন, তাদের কাছে সাহায্য চাইতে হবে। অগ্নিকাণ্ডের সময় ভবন থেকে বের হবার জন্য লিফট ব্যবহার করা যাবে না। এ সময় সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। অগ্নিকাণ্ডের সময় যতোটা সম্ভব শরীরের বাড়তি কাপড় খুলে ফেলতে হবে। বিশেষ করে যদি আপনার শরীরে কোনো সিনথেটিক জাতীয় কাপড় থাকে তবে তা অবশ্যই খুলে ফেলতে হবে। কারণ সিনথেটিক জাতীয় কাপড়ে আগুন খুব দ্রুত লেগে যাবার আশঙ্কা থাকে। অগ্নিকাণ্ডের সময় আপনি যদি কোনো মার্কেট বা কারখানায় থাকেন, তখন যদি সম্ভব হয়, সুতির কাপড় পানিতে ভিজিয়ে নাকে মুখে চেপে শ্বাস নিন। অগ্নিকাণ্ডের সময় বাড়ি থেকে সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা দিয়ে বের হতে হবে। এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে পথ দিয়ে বের হচ্ছেন তার অপরপাশ আপনার জন্য নিরাপদ কি না। যদি তখন আগুনের কালো ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে যতোটা সম্ভব মাটির সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে বের হতে হবে। কারণ এ ধোঁয়া আপনার ফুসফুসে চলে গেলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এ সময় ওপরের ঠান্ডা বায়ু নিচে নেমে আসে। তাই নিচের বায়ু অনেকটা নিরাপদ। এ বিষাক্ত ধোঁয়া বা গ্যাসে মানুষ প্রথমে অজ্ঞান হয়ে পরবর্তীতে পুড়ে মারা যায়। অগ্নিকাণ্ডের সময় আপনি যদি গাড়িতে থাকেন, অবশ্যই তা থামাতে হবে। এ সময় গায়ে আগুন লেগে গেলে দৌড়াদৌড়ি না করে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে। অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রথম কাজ হিসেবে আপনি নিজে নিরাপদ হবেন এবং পরে এলাকার আরো কিছু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পাঠিয়ে দেবেন। যাতে করে এ সময় ফায়ার সার্ভিসের কাজ করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

বিষয়: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, বুয়েট, মণিপুর হাই স্কুলে এন্ড কলেজ

তারিখ: ০৪.০৪.২০২১, বেলা: ১২-০০টা

প্রধান অতিথি ও বিচারক: জনাব মাসুদুর রহমান

সহকারী কিউরেটর

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

শাহরিয়াজ হাসান
একাদশ শ্রেণি
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

জলবায়ুর পরিবর্তন মানব সমাজের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক ঘটনা। আবহাওয়ার যে নিয়ামক গুলো রয়েছে তার দীর্ঘ দিনের গড় অবস্থাকে বলা হয় জলবায়ু। কোন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন নিয়ামকের কারণে পরিবর্তন হতে পারে এবং এ পরিবর্তন কয়েক যুগ বা লক্ষ লক্ষ বছর স্থায়ী হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাবও রয়েছে আবার নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাবের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাব বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় ও সাইক্লোন দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব দ্বারা আক্রান্ত। বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, নার্গিসের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ০.৩ থেকে ০.৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে এই বৃদ্ধি অতি অল্প মনে হতে পারে কিন্তু এর ফলে অনেক বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি খাদ্যের চাহিদাও ক্রমশ বাড়াচ্ছে। এর ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটাবে এবং তা সরাসরি কৃষি উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলবে। তাছাড়া মাটির গুণাগুণ, কীট এবং রোগের চরিত্রের উপরও জলবায়ু পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাব পড়বে। চরম জলবায়ু যেমন প্রচন্ড বৃষ্টিপাত, উচ্চ তাপমাত্রা, বন্যা, খরা প্রভৃতি শস্য উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন মানুষের স্বাস্থ্যে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। তাপজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে, সংক্রামক রোগের বিস্তার হবে, ডিহাইড্রেশন হবে, অপুষ্টি বাড়বে এবং জনস্বাস্থ্যর পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাহমিদ হোসেন
লেভেল-৩
বুয়েট

আমাদের চারপাশে যে জল, বায়ু এবং প্রকৃতির অন্যান্য যে নিয়ামক গুলো রয়েছে এই নিয়ামক গুলোর যে রুপ, তার দীর্ঘ দিনের গড় অবস্থাকে আমরা সাধারণত জলবায়ু বলি। অর্থাৎ কোন এলাকার পরিবেশের দীর্ঘদিনের গড় অবস্থা।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান জাদুঘরের নতুন আকর্ষণ

যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ
ও
নতুনত্বে ভরা মিউজিয়াম বাস

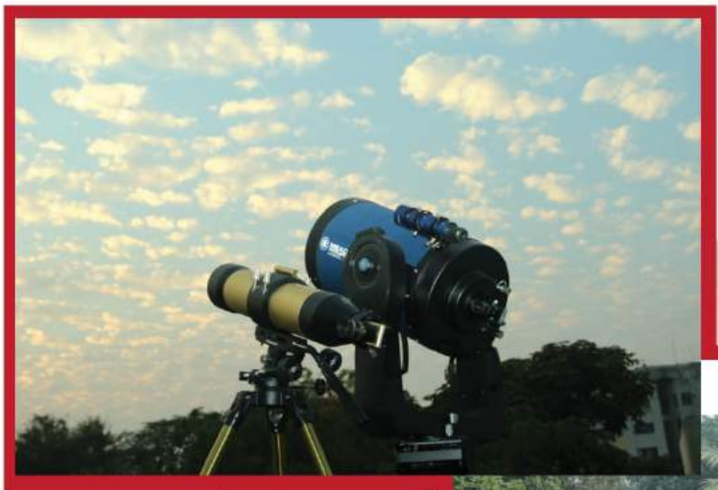

অনলাইনে নিম্নোক্ত http://nmst.sobticket.com/ এই লিংকে টিকিট পাওয়া যাবে

https://www.facebook.com/nmstbdpg/

www.nmst.gov.bd

যোগাযোগঃ ০২-৫৮১৬০৬১২, ০২-৫৮১৬০৬১৬
মোবাইলঃ ০১৩০৯-৩১৩০৬১